৩.২ চরমপন্থীদের লক্ষ্য

চরমপন্থীদের মূল লক্ষ্য তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ধারা, মান ও মাত্রাকে বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বেই আলোচনায় একথা নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বলা যেতে পারে, চরমপন্থী লক্ষ্যের পেছনে ছিল তাদের আমূল সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, আর এই দৃষ্টিভঙ্গি হল প্রধানত কংগ্রেসের নরমপন্থী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরব প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবাদ। নরমপন্থী নেতৃত্ব ব্রিটিশ শাসক ও জনমতের কাছে যে ভিক্ষুকমূলক আবেদন পেশ করেছিল চরমপন্থী নেতৃত্ব তা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি, কারণ এতটা অসম্মানজনক ও অকার্যকর প্রয়াস তাঁদের কাছে শুধু দৃষ্টিকটুই নয়, বিভ্রান্তিকর মনে হয়েছে। এই নরমপন্থী প্রয়াসে না ছিল ব্রিটিশ রাজশক্তিকে সমালোচনা করে কোনো আন্দোলনের ডাক বা না ছিল কোনো গঠনমূলক, জনমুখী কর্মসূচি। নরমপন্থীরা ইংরেজ উদারবাদী ভাবনা ও শিক্ষার মানদণ্ডেই বিচার করেছেন সবকিছু, চরমপন্থীরা প্রকৃত রাজনৈতিক পন্থা বা বিপ্লবী অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করেন ভারতের সমস্যা ও তার সমাধানের পথ। চরমপন্থী কর্মসূচির বিপ্লবী ভাবনাকে সার্থক রূপ দিতে চেয়েছেন অরবিন্দ ঘোষ, বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল ও সে যুগের বিপ্লবী সমিতি ও তার নেতারা। বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব, পুনা ছিল বিপ্লববাদের প্রধান কেন্দ্র। ব্রিটিশ বিদেশনীতি, শুল্কনীতি, শিল্পনীতি, প্রশাসনিক নীতি নিয়ে চরমপন্থীদের ব্যাপক অসন্তোষ ও বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। কার্জনের স্বায়ত্তশাসন, বঙ্গভঙ্গ ও বিশ্ববিদ্যালয় নীতি নিয়ে চরমপন্থীদের অসন্তোষ তুঙ্গে উঠেছে। স্বরাজ, স্বদেশি ও বয়কটের দাবি নিয়ে নতুন নেতৃত্ব, সাধারণ মানুষ ও যুবকদের সামনে রেখে নতুন ও চরম কৌশল নিয়ে এগিয়ে এল।

কী ছিল চরমপন্থীদের দাবি?

(১) **ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত চেহারা (চরিত্র) উন্মোচন করা।** জনসাধারণকে বোঝানো হল ভারতের দারিদ্র্যের মূল কারণ ব্রিটিশ শাসন, ভারতবাসীর দুঃখদুর্দশা বা কল্যাণের বিষয়ে রাজশক্তি কোনো নজর দেয়নি। চরম দুর্ভিক্ষ, ব্যাপক দারিদ্র্যের মুখে এদেশকে পতিত করেছে ব্রিটিশ শাসক। তাদের শাসনের নীতি ছিল কূটনীতি আর অস্ত্র। রানাডে, নৌরোজি, রমেশচন্দ্র দত্তের মতো নরম নেতারাও 'Un-British Rule', আর্থিক শোষণ ও দারিদ্র্য নিয়ে মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছেন। গোখলে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের মধ্যে

দেখেছেন জাতীয় আবেগকে ক্ষুণ্ণ করে স্বার্থসর্বস্ব একতরফা বিজাতীয় নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার ছলচাতুরী। চরমপন্থীরা সরাসরি এই কূটকৌশল ও ছলচাতুরীর বিরুদ্ধে দাবানল ছড়ালেন।

(২) **নরমপন্থার আদর্শ ও কৌশলের অবলুপ্তি।** চরমপন্থী নেতৃত্ব চেয়েছেন নরমপন্থার আদর্শ ও কৌশল নিয়ে আর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সম্ভব নয়। নরমপন্থীদের আন্দোলন যে ফলদায়ক হতে পারে না, এদের অধিবেশনগুলিকে যে আর তামাশা আর ছুটি কাটাবার নিছক আসরে পরিণত করা যায় না একথা ভেবেই তাঁরা চাইলেন, বন্ধ হোক পুরোনো উৎসব পালনের প্রথা, শুরু হোক নতুন বহ্নি জ্বালানোর কাজ। নতুন আলোক প্রজ্বলনে সাথী হল বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মুনসী রামের ভারতমন্ত্র, স্বদেশ ও সভ্যতার জাগরণ। রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে ব্রিটিশ শাসকের কাছে চাওয়া হোক স্ব-শাসনের দাবি। দাবিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত চরম লড়াই চলবে অবিরাম।

(৩) **ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের অবসান।** চরমপন্থীদের দাবিপত্রের শিরোনামে উঠে এল ব্রিটিশ শাসনের অবসানের জন্য লড়াই। শিল্পনীতি, শুল্কনীতি, ভূমিনীতি, রাজস্ব নীতি—সব নীতির মূলে ছিল শাসকের শোষণ ও নিপীড়নের ব্যাপক ষড়যন্ত্র। দারিদ্র্যের জ্বালা, বেকারত্ব, পুলিশি জুলুম ব্রিটিশ শাসকের প্রতি সবরকম আস্থা ও বিশ্বাসে ভাঙন ধরিয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতীয় জনমনে যে আঘাত এসেছে তার একমাত্র প্রতিরোধ এই শাসনের হাত থেকে নিবৃত্তি। চরমপন্থীরা এটাই চেয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি জনগণের বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণাকেই এই শাসনের বিলোপের লক্ষ্যে কাজে লাগাতে চেয়েছে চরমপন্থীরা। প্লেগসহ প্রাকৃতিক ও প্রশাসনিক দুর্বিপাকের দায় ব্রিটিশ সরকারের উপরেই চাপিয়ে সংগঠিত আন্দোলনের যে চাপ চরমপন্থীরা সরকারের উপর রেখেছেন তার অনিবার্য পরিণতি হল সামরিক জাতীয়তাবাদী পথে রাষ্ট্রশক্তির পতন।

(৪) **সামাজিক ও ধর্মীয় পুনরুত্থান।** চরমপন্থী আন্দোলনের অন্য একটি লক্ষ্য হল দেশে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনা। রামমোহন, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ—যেখান থেকে যতটা সম্ভব পুনরুত্থানের এই শক্তি সঞ্চয় করেছেন চরমপন্থী নেতারা। আধ্যাত্মিক সংস্কারই চরমপন্থীদের চেতনা ও সাহসকে জাগ্রত করেছে। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে মিশিয়ে লড়াইকে মানুষের মধ্যে নিয়ে গেছেন অরবিন্দ ঘোষ, তিলক, লাজপৎ রাই, বিপিন চন্দ্র পাল সকলেই। প্লেগ ও মহামারি রোধে বোম্বাই সরকারের ব্যবস্থাগুলি শুধু কৃষক ও কারিগরের দুর্দশার কারণ হয়নি, উস্কে দিয়েছে ধর্মীয় উন্মাদনা। মহামারি, প্লেগ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কুসংস্কারকে আঁকড়ে থাকা মানুষের মধ্যে বিভেদের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে সরকার। সরকারের জুলুম নিয়ে গর্জে উঠেছেন তিলক ও তাঁর '*কেশরী*' পত্রিকা। মহামারি নিয়ন্ত্রণে রোগাক্রান্তদের পৃথকীকরণের প্রস্তাব দিলেও বা হিন্দুদের জন্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহযোগিতা করলেও তিলক চেয়েছেন হাসপাতাল নিয়ে মিথ্যে গুজব যেন না ওঠে, সরকারি ব্যবস্থা যেন অমানুষিক না হয়ে ওঠে এবং স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা যেন নিয়মিত বস্তি পরিদর্শনে যান। আর্তত্রাণের জন্য কমিটি গড়ার প্রস্তাবও তিনি দেন, যেখানে এদেশীয় প্রতিনিধি থাকবে। পুনা, লক্ষ্ণৌ, সর্বত্রই শুরু হয়ে গেল আন্দোলন। তিলকের গ্রেপ্তারি আন্দোলনকে আরও উত্তেজনা ও ক্রোধের মুখে টেনে এনেছে। বোম্বাই সরকারের হঠকারিতা তিলককে রীতিমতো শহিদের মর্যাদা দিল এবং এর লভ্যাংশ পেলেন হিন্দু উগ্রপন্থী ও পুনরুত্থানবাদীরা। সরকারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সেনাবাহিনীর জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোয় র‍্যান্ডের উগ্র কার্যকলাপের নিন্দায় মুখর হলেন তিলক।

(৫) **ব্রিটিশ সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি উগ্রপন্থী আন্দোলনের কর্মনীতির অন্য এক সুবিধা ও সুযোগ সৃষ্টি করেছে** বলা চলে। সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতির প্রবণতাটি আলিগড় আন্দোলনের এবং আলিগড় কলেজ স্থাপনের যুগ থেকেই (১৮৭৭ খ্রি.) সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে শুরু হলেও, ব্রিটিশ শাসনই ছিল মুসলিম স্বার্থের রক্ষাকবচ এটা ব্রিটিশ সরকারও বুঝতে পেরেছে এবং এই সুযোগটিই সরকার নিয়েছে তার 'বিভাজন

ও শাসন' (Divide and Rule) নীতির মাধ্যমে। ব্রিটিশ নীতির প্রত্যক্ষ প্রতিফলন লক্ষ করা গেল প্রাথমিকভাবে দুর্ভিক্ষ, মহামারি (যা প্লেগ ব্যাধির মাধ্যমে মারাত্মক রূপ নিয়েছিল মহারাষ্ট্রে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে) জনিত অবস্থায় সাম্প্রদায়িক পৃথকীকরণের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য পরিসেবার ও ত্রাণ ব্যবস্থার মাধ্যমে। ব্রিটিশ সরকার কিন্তু কুসংস্কার আঁকড়ে থাকার জন্য হিন্দুদের দায়ী করেছেন। সাম্প্রদায়িক অবমাননা ও ভীতির প্রকাশ্য পরিণতি র‍্যান্ড ও আর্য়াস্ট-এর হত্যাকাণ্ড। যে হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন জোগানোর জন্য তিলকের গ্রেপ্তার হবার কাণ্ডও ঘটে যায়। সন্দেহ নেই চরমপন্থী আন্দোলন তিলকের গ্রেপ্তারির এই সুযোগকে পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে। অমলেশ ত্রিপাঠীর কথায় :

"অতি-উত্তেজিত বোম্বাই সরকারের হঠকারিতা তিলককে শহিদে পরিণত করে। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিলকের দৃপ্ত জবানবন্দিকে (১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ট্রটস্কির ভাষণের সঙ্গে তুলনীয়) যদি চরমপন্থার প্রথম বিঘোষণার মর্যাদা দেওয়া যায় তবে তাঁর স্বল্পমেয়াদি কারাদণ্ডও নিঃসন্দেহে হিন্দু উগ্রপন্থীদের রাজদ্রোহের পথ নেওয়ার প্রধান প্ররোচনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এলগিনের আপত্তি সত্ত্বেও ভাইসরয়-এর আইন পরিষদ দেশীয় সদস্যদের উপর চাপ সৃষ্টি করে 'ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোডে'র ১০৯ নং ধারা এবং 'ভারতীয় পেনাল কোডে'র ৫০৫ নং ধারার সংশোধন করে। অতি-বশংবদ নরমপন্থীদের আবেদন-নিবেদনের অসারতা প্রমাণ করে দিয়ে সরকারের এই দমননীতিই পরোক্ষে চরমপন্থীদের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করে দিয়েছিল। চরমপন্থীদের জনপ্রিয়তা ক্রমশই বাড়তে থাকে।"[২৪]

(৬) **চরমপন্থার নীতি স্পষ্ট রূপ পেল বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সরকারি সিদ্ধান্তকে ঘিরে**। বলা যেতে পারে, কংগ্রেসের উদার নেতৃত্বের রাশ আলগা হতে শুরু করেছে এই সময় থেকেই এবং চরমপন্থীদের নেতৃত্ব ক্রমশ দৃঢ় হতে শুরু করেছে। বঙ্গভঙ্গের চরম প্রতিক্রিয়া শুরু হবার আগেই কার্জনের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতি বিরূপতা, শিক্ষাসংস্কার নিয়ে প্রস্তাব, দেশীয় সংবাদপত্রের প্রচার বন্ধ করার নীতি এবং সর্বোপরি সরকারি সামরিক আইন (Official Secrets Amendment Act) নিয়ে বাদানুবাদ শুরু হয়ে গিয়েছে। কার্জন লিটনের প্রচলিত প্রস্তাবকেই শীলমোহর দেবার প্রচেষ্টা করলে পরিস্থিতি রীতিমতো ঘোরালো হয়ে ওঠে। এরপর বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব এলে আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা গেল না। বিপান চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী, বরুণ দে-র কথায়, "Finally came the partition of Bengal. It was ostensibly for better administration of an unwidely province but really for curbing the radical Bengali nationalists. Administrative convenience and development of Assam were the avowed objects of the plan. But politics had crept in. The officials talked of freeing the eastern districts from the pernicious influence of Calcutta' and a juster deal for the Moslems."[২৫] পূর্ববঙ্গের ভাখরাগঞ্জ ও ফরিদপুর ছিল চরমপন্থীদের আখড়া। প্রস্তাব এল এগুলিকে ভাগ করে দেবার। প্রতিবাদে মূর্ত হল বাংলা। কংগ্রেস এই পরিকল্পনাকে অযৌক্তিক ও হাস্যকর বলে উপহাস করে। কার্জন, রিসলে, হার্ডিঞ্জের বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব জমিদার, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, শহরের গরিব সর্বস্তরের মানুষের কাছে উষ্মার কারণ হয়ে দাঁড়াল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি আন্দোলনের প্রথম উদ্যোগ নিলেও, বিপিন চন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ ক্রমশ আন্দোলনের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ালেন। সর্বভারতীয় স্তরে এই নেতৃত্বের শীর্ষে রইলেন 'লাল-বাল-পাল'। অনশন, বয়কট আর 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে মুখর হল বঙ্গদেশ। সঙ্গে ছিল স্বদেশী সংগীত আর রাখিবন্ধনের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের অটুট শপথ বাণী।